নীলষষ্ঠী

সুজয় ময়দানের ধারে ফুটপাথ ধরে হাঁটছে একটু জোরের ওপরে। শরীরে কিছুটা ফ্যাট জমেছে। বিশেষ করে ভুঁড়িটা এমন বেঢপ হয়েছে। ডাক্তারের পরামর্শে ডায়াট কন্ট্রোলের চিরাচরিত ব্যবস্থা না করে নিজের মত করে সন্ধ্যার পর ময়দানের চারধারে পাক খায়। ফলে শরীরের যে কিছুটা উন্নতি হয়েছে তা বেশ বুঝতে পারে সুজয়।

হঠাৎ একজন মহিলাকে দেখে থমকে যায় সুজয়। নিজের মধ্যে প্রশ্ন করে, সীমা না ....! কিছুটা দূরে পেছন থেকে সীমার মতই তো মনে হল। ময়দানের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে একজন লোকের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে।

ব্যাপার কি...! কিছু প্রশ্ন, কিছু দুশ্চিন্তা কপালে ভাঁজ ফেলে। এমনটা তো হবার নয়। এ অসম্ভব। সুজয়ের নিজের কাছে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। নিজের চিন্তা-ভাবনা, শিক্ষা-দিক্ষা, বিশ্বাস-নিষ্ঠার দোহাই...., না। এতখানি ভুল হবার কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া এ তো সুজয়ের নিজের কোন হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার ব্যাপার নয়। এতো পরের স্বার্থে পরের জন্যে আলোর সন্ধান করা। সন্ধান দেওয়া। সুজয় মনে করে মানুষ খারাপ হয় অভাবে বা পারিপার্শ্বিকতার চাপে। সেখানে উচিৎ খারাপ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তাকে অন্ধকার থেকে টেনে এনে আলোর মাঝে দাঁড় করানো। এটা নিশ্চয় একজন সুস্থ মানুষের মানবিক দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। সুজয় ভাবে, তার মনটা যে বড় নরম। সবার ভাল চায়। নিজেরও ভাল হোক। কেননা নিজের জীবনটা যে বড় রুক্ষতায় ভরা—নানা জ্বালা যন্ত্রনায় জর্জরিত। খুব বেশী দিনের কথা নয়—বলা যায়, এই সেদিনের ছবিগুলো মনের মধ্যে নড়েচড়ে ওঠে।

সেদিন রাস্তায় সীমার সঙ্গে আলাপ হয় এক নাটকীয় পরিবেশে। হঠাৎ পা বেধেই হোক আর পিছলেই হোক সীমা রাস্তার ওপর সজোরে পড়ে যায়। সুজয়ের মনে পড়ে—সুজয় সামনে থাকার সুবাদে হাত ধরে টেনে তোলে সীমাকে। হাত-পা ছেঁচড়ে যায়। রক্ত ঝরে কয়েক জায়গা থেকে। সুজয়ের ব্যাগে জলের বোতল ছিল। বার করে জল দিয়ে জায়গাগুলো ধুয়ে ফেলতে সাহায্য করল। সেই আলাপ। দীর্ঘ দিন কেটে গেছে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে। পরিচয় গভীর হয়েছে। সীমার জীবন বৃত্তান্তের অনেকখানি সাক্ষী আজ সুজয়।

এক ছুটির দিন। সীমাকে নিয়ে গঙ্গার পারে বেড়াতে বেড়াতে কত পুরানো দিনের কথা শুনতে থাকে সুজয়। সীমার কথায় কথায় রপ্তে রপ্তে বেরিয়ে আসে সে সব। সীমা বলে, জানেন আমি একটা ছেলেকে ভালবাসতাম। আমাদের বাড়িতেই ভাড়া থাকত। চাকরিও করতো। সদ্য চাকরি পেয়েছে। দেখতে বেশ সুন্দর। আমার মন তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। গোপনে মেলা মেশা করতে থাকি। কত স্বপ্ন দেখতুম। বিয়ে

করব। মাকে দিয়ে বাবার কাছে প্রস্তাব পাঠালুম। কিন্তু বাবা রাজি নয়। বেজাতের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে না। রানা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। অবশ্য স্বেচ্ছায় নয়। বাবা প্রায় বাধ্য করেছিল বাড়ি ছাড়তে। সীমা চুপ করে।

দীর্ঘ নীরবতার অস্বস্তিটুকু কাটাবার জন্য সুজয়ই প্রশ্ন করে,

—আর কোন দিন রানার সঙ্গে দেখা হয়নি?

—না, বহুদিন পরে একবার দেখা হয়েছিল বটে, তবে তখন রানা বিয়ে করেছে তার জাতেরই একজন মেয়েকে।

—বাবা তোমার বিয়ের আর কোন চেষ্টা করেননি?

—হ্যাঁ, তা অবশ্য করেছিল। কিন্তু আমিই সব ভণ্ডুল করে দিতুম।

.....মানে বাবার ওপর শোধ নেবার জন্যে সব সম্বন্ধগুলো নষ্ট করে দিতুম। তারপর বাবাও মারা গেল কিছু দিন বাদে। আমার দাদারা তো একটাও মানুষ হয়নি। বিয়ে করে যে যার সংসার নিয়ে বাড়ি ছেড়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় চলে গেল। আমরা বোনেরা অগাধ জলে পড়ে গেলুম। বাবার অত বড় ব্যবসা রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট শূন্য। মাও বাবার কিছু দিন আগে মারা যায়। উদাসভাবে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে সীমা।

গম্ভীর পরিবেশটাকে হাল্কা করার জন্য সুজয় আবার প্রশ্ন করে, তুমি কতদূর পড়াশুনা করেছ?

—এইচ. এস. পর্যন্ত। আর পড়াশুনা ভাল লাগল না। ছেড়ে দিলুম।

—অন্য বোনেরা।

—ওরা তথৈবচ।

কিছু পরে সুজয় প্রশ্ন করে, তাহলে তোমাদের চলে কিভাবে? প্রশ্ন শুনে সীমা তখনি কোনো উত্তর দেয় না। অনেক পর বলে, আমাদের বাড়ি রাস্তার ধারে। বাড়ির এক তলায় তিনটে দোকানঘর ভাড়া আছে। তার ভাড়া তুলে কোনোরকমে দিন চলে যায়। মেজবোনই ভাড়া তোলে। সব টাকা ওই রেখে দেয়। একটা পয়সাও দেয় না। সুজয় তেমন কোনো প্রসঙ্গ না পেয়ে চুপ করে থাকে।

—জানেন, একদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল। সুজয় সীমার মুখের দিকে কৌতূহলে তাকালো। ভদ্রলোকের নাকি খুব জানাশোনা আছে, স্টুডিও পাড়ায়। টুকটাক নাকি অভিনয়ও করে। আমাকে অফার দিল, যদি আমি রাজি থাকি, সুযোগ করিয়ে দেবে। আমার চোখে স্বপ্ন জেগে উঠল, সিনেমায় অভিনয় করব?...., লোভে আশায় আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কত মানুষ আমায় চিনবে। অনেক টাকা হবে। এক কথায় রাজি হয়ে গেলুম।

তারপর টুকটাক দু'চারটে খুব ছোট ছোট সিনে থাকার সুযোগ পেলুম। হাতে কিছু পয়সা এল— আমার কাছে একেবারে যেন এক স্বপ্ন। আরো বড় স্বপ্ন দেখতে লাগলুম। লোকটিকে খুব ভরসা করলুম। সেই সুযোগে লোকটি পুরোপুরি সুযোগ নিল... যখন তখন লোকটার শয্যাসঙ্গিনী হলুম। লোকটির পছন্দ মত অন্যলোকের

সঙ্গেও...., যারা নাকি বড় সোর্স... সুযোগ পাইয়ে দেবে...। সীমা চুপ করে রইল। কিছু পরে আবার বলতে শুরু করল, বছর খানেক কাটার পর বুঝলুম, না স্বপ্ন। শুধুই স্বপ্ন...মরীচীকা মাত্র। আসলে ওটা একটা ছুতো মাত্র। ঐ ইতর লোকগুলোর যা ইচ্ছা ছিল তা-ই করে নিল। পয়সা রোজগারের লোভে পড়ে গেলুম। আসলে অভাব যে মানুষের কত সর্বনাশ করে... তখন বুঝতে পারে না, সে কোথায় চলে যাচ্ছে। আবার কিছুটা থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সীমা বলে সেই শুরু...। বাড়িতে গার্জেন বলে তো কেউ নেই, যা মনে হয় তা-ই করি। বোনেদের টেক্কা দেবার ইচ্ছা...। দু'বেলা পেটভরে ঠিকমত খাবার জোটে না। তাছাড়া বোনেদের হিংসা আমার হাতে অনেক টাকা আছে। সিনেমায় কাজ করি। ফলে প্রায় দিনই বোনেরা আমার কোন খাবার দাবার রাখতো না। কোন খবরও রাখত না...। আমি যে এখন এক অন্ধকারের জীব....। কিভাবে কত সহজে আমার এমন পাতালে নেমে যাওয়া—তা কি ঠিক ঠিক আমিও বুঝতে পেরে সময়ে নিজেকে ঠেকাতে পেরেছিলুম...?

সীমা চুপ করে থাকে। হয়তো সীমার অন্তর্লোকে বোবা কান্নার সঙ্গে তীব্র রক্তক্ষরণ চলতে থাকে।

সুজয়ও নিশ্চুপ। শুধু মনের মধ্যে ভাবনাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে চলে—অনেক কিছু বলা যায়..... অনেক তিরস্কার বা স্তোকবাক্য বা অন্যকিছু বিজাতীয় কথা। সেতো শুধু কথার কথা, উপসম কোথায়।..... কোন অব্যর্থ ওষুধ.... তেমন কোন চিকিৎসা?

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। একটু আগেও নদীর ওপারে ঘরবাড়ি, গাছ-পালা, কল কারখানার চিমনি বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, যা এখন অন্ধকারে ডুবে গেছে। নদীর বুকে ভেসে থাকা লঞ্চ বা স্টীমারগুলোর আলো জ্বলে উঠেছে। তার প্রতিফলন ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নেচে চলেছে। সেদিন সন্ধ্যা রাত্তিরটা বোবা যন্ত্রনার সাক্ষী হয়ে থাকে। এক সময়ে সুজয় উঠে পড়ে। সীমাকে বাসে তুলে নিজেও বাড়ি ফেরে।

"দুই"

সেদিন সুজয় তার কার্য্যোপলক্ষ্যে দমদমের দিকে যায়। একটু তাড়াতাড়িই রওনা দিয়েছিল। কাজটাও অল্প সময়ে মিটে যায়। ঝিপঝিপ করে সারাদিনই বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তা-ঘাট প্যাচপ্যাচে জল কাদায় ভরা। সুজয়ের বুকের মধ্যে একটা ইচ্ছা গুড়গুড়িয়ে ওঠে। মোবাইলটা বার করে নম্বর মেলায়। রিং হয় বারে বারে। অনেক পরে সীমার কণ্ঠ ভেসে আসে—হ্যালো, হ্যালো কে বলছেন?

—আমি, সুজয়দা। তোমাদের বাড়ির খুব কাছে এসেছি। তোমাদের বাড়িটা কোথায়, যেতে পারবো?

—নিশ্চয়ই। আপনি অভয়া বিদ্যাপীঠের সামনে দাঁড়ান, আমি এখুনি যাচ্ছি। আমার সঙ্গেই আসবেন।

স্কুলের সামনে একটা চায়ের দোকান দেখে বাইরের দিকে বেঞ্চে সুজয় এক কাপ চা নিয়ে বসে। কিছু পরে সীমা এসে হাজির।

রাস্তার ধারেই বাড়ি। নিচে চার কামরা ঘর। দোতলা বাড়ি। ওপর তলায় সীমারা

থাকে। বাড়ির পেছনদিকে কিছুটা খালি জমি আছে। নানারকমের গাছে ভরা। সুজয় একটু অবাকই হয়। সীমারা এ বাড়ির মালিক....কেমন যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। সীমা দোতলার একটা ঘরে সুজয়কে বসায়। কিছু পরে দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি দেখিয়ে বলে, দেখুন, এটা আমার বাবার ছবি। ভদ্রলোক বেশ গাঁট্টা গোট্টা। নাকটা বেশ তীক্ষ্ণ। নাকের নীচে মোটা ঘন গোঁফ। চিবুকটা বেশ বলিষ্ঠ। সুখী সুখী মুখের আদল। সীমা বলে, বাবা খুব মেজাজি মানুষ ছিল। দু'হাতে টাকা খরচ করত। বাবার তো গাড়ির কারবার ছিল আর ঐ দেখুন মায়ের ছবি। মা অবশ্য বাবার আগেই মারা গেছে। মুখের মধ্যে একটা কারুণ্যের ছায়া। চোখ দুটো ম্লান....দুঃখে মাখা। কেমন যেন সুজয়ের মনে হল, ঐ মুখের মধ্যে অনেক যন্ত্রনার গল্প চাপা দেবার একটা আপ্রাণ চেষ্টা ফুটে আছে।

সুজয় চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বসে। সীমা বলে, একটু বসুন। আমি আসছি। প্রায় মিনিট পনেরো পরে প্লেটে দুটো রসগোল্লা নিয়ে হাজির। একটু মিষ্টি মুখ করুন বলে প্লেটটা হাতে ধরিয়ে দেয়। কিছু পরে একে একে দু'বোন এসে হাজির। নানা আলাপের মধ্যে দিয়ে অনেক সময় কেটে যায়।

সীমা বলে, চলুন না সুজয়দা বাড়িটা একবার ঘুরে দেখবেন। আমাদের বাগানটা....। সুজয় দেখল, নিচে চার কামরা ঘর—একেবারে রাস্তার ধারে। তিনটে ঘর দোকানদারদের হাতে। একটা এমনি খালি পড়ে আছে—কিছু কাঠ কুটো, নানা প্রয়োজনীয়—অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ভরা। বাড়ির মধ্যে দিয়ে ঘরের পেছনের দরজায় ছিটকিনি লাগানো। ঘরগুলোর পেছনে বাড়ির মধ্যে বেশ চওড়া দাওয়া। দাওয়ায় দাঁড়ালে বাড়ির পেছনে গাছপালায় ভরা বাগান। কিছুটা বা বাড়ির খালি অংশ। সীমা সুজয়কে নিয়ে বাগানে ঢোকে। বাগান-মানে কোনো সাজানো গোছানো বাগান নয়। এলোমেলো অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছ-গাছালি। একটা সজনে গাছ.... তার ঝিরঝিরে পাতা বাতাসে কাঁপছে। গাছে ভরা কচি কচি সজনে ডাঁটা ঝুলছে। খান কয়েক কলাগাছ...একটায় সদ্য মোচা ফলেছে আর একটায় বেশ পুরুষ্ট কলার কাঁদি ঝুলছে। ঝোপ ঝাড় আগাছায় ভর্তি বলে আর এগোনো গেলনা। যদি কোন সাপটাপ...।

সীমা সুজয়কে নিয়ে আবার দোতলার ঘরে গিয়ে বসে। সুজয়ের মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে যায়। সীমা আর তার বোনেদের সামনে বসিয়ে সুজয় তার পরিকল্পনার কথা বলে, আচ্ছা তোমরা তো খালি ঘরটা কোন দোকানদারকে ভাড়া দিতে চাইছো, এক বোন বলল, হ্যাঁ...তাছাড়া আর উপায় কী, টাকা যখন দরকার? বেকার খালি ফেলে রাখার কোন মানে আছে! সুজয় বলল, ঠিক তাই। আমি তোমাদের একটা রাস্তা বলে দিতে পারি...., সবাই সুজয়ের মুখের দিকে উৎসাহে তাকায়।

সুজয় তার পরিকল্পনাটা খুলে বলে, দেখ তোমরা বোনেরা সবাই বেকার। তোমরা ঐ ঘরটা ভাড়া না দিয়ে নিজেরাই একটা দোকান করতে পার। না, না তেমন কোন টাকা পয়সা ফেলতে হবে না, স্রেফ কচুরির দোকান। লোকে আসবে খাবে, নগদা পয়সা দিয়ে যাবে। আলুর দম আর কচুরি। চা-টাও রাখবে। তোমরা রান্না করবে। চা

করবে। বাড়িতে তোমাদের যে বাসন-কোসন আছে তাতেই হবে। খালি কতকগুলো কাপ কিনতে হবে আর শালপাতার বাটি। দু-বেলা খুললেই হবে। সকালে ১১টা পর্যন্ত আর বিকেলে চারটে থেকে আটটা পর্যন্ত বড় জোর। দেখবে তোমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে কেমন সময় কেটে যাবে। হাতেও ভাল পয়সা আসতে থাকবে। সুজয় থামতেই সীমা সহ বোনেরা খুশিতে হৈ হৈ করে ওঠে—এমনটা তো আমরা কোন দিন ভাবিনি।

সুজয় বলে, তা হলে শুভস্য শীঘ্রম। সামনের ১লা বৈশাখে দোকানটা উদ্বোধন করে ফেল। সেদিন সুজয় ফিরে যায় গভীর এক আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে। এ এক আলাদা আনন্দ যার কোন তুলনা নেই। সুজয় বিশ্বাস করে মানুষের ভাল করতে পারলে....সুজয়ের মন সুখানুভুতির পরম ঐশ্বর্য্যের ছোঁয়ায় সোনা হয়ে ওঠে।

"তিন"

অনেক দিন কেটে গেছে। সীমার কোন খবর সুজয় জানে না। জানার তেমন কোন সুযোগও হয়নি। হঠাৎ সীমার মত একজনকে দেখে সব কেমন একে একে স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে সারি বদ্ধ ঘটনাপুঞ্জ। সীমাদের দোকান খোলার পর সুজয়ের টানটান কৌতুহল ছিল ওদের কেমন চলছে, কেমন আছে? সুজয় ভাবে, হঠাৎ শরীরটা খারপ হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী। দীর্ঘদিন টাইফয়েডে ভুগে শরীরটা বেশ কাহিল হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছেন, সকালে বিকালে ফাঁকা জায়গায় হাঁটবেন। সঠিকভাবে খাওয়া দাওয়া করবেন, বেশিক্ষণ কোন বদ্ধ জায়গায় কাটাবেন না। ক'দিন পর আজ আবার ময়দানে বেড়াতে এসেছে। আজ কেমন যেন হাঁটাহাঁটি করাতে হাঁফ ধরছে। ফলে গাছের তলায় সিমেন্টের বাঁধানো বেঞ্চে বসে বিশ্রাম নেয় সুজয়।

অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্ধকার ফুঁড়ে এক পুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে আসে সীমা। সুজয়ের মুখোমুখি হতেই থমকে যায়। সুজয় উঠে দাঁড়ায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সীমার দিকে—মনে মনে বলে তাহলে তখন ভুল দেখিনি। গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বলে—তুমি, ছিঃ ছিঃ। ততক্ষণে পুরুষ সঙ্গীটি অনেক দূরে ছিটকে গেছে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সীমা। সুজয় আবেগে হতাশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে। কষে এক চড় মারে সীমার গালে। উত্তেজিত সুজয় কাঁপতে থাকে নিজের মধ্যে—এভাবে যে নিজের আত্মবিশ্বাস ...অহংকার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি। সীমা কোন কথা না বলে ধীর পায়ে চলে যায়। সুজয় নিজেকে ব্যঙ্গ করে বলে, মানুষকে শুধরে আলোর পথে নিয়ে আসবে...এত বড় তোমার হিম্মত....আস্ফালন.....। তুমি মহামুর্খ সুজয়...।

মানুষ তার ব্যক্তিগত আবেশে, পারিপার্শ্বিকতার আবহে নিয়ন্ত্রিত হয়। বাইরে থেকে তার ওপর কিছু চাপিয়ে দিলে হয়তো অনেক সময় ব্যর্থতায় ঢেকে যায়। এমনই এক ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি হয়ে বিব্রত সুজয় তার দুর্বল পায়ে সেদিন বাড়ি ফিরে আসে।

"চার"

ক'দিন পরে সুজয় তার বাড়ির ঠিকানায় স্পীড্ পোষ্টে একটা চিঠি পায়। খামটা খুলে দেখে লেখা আছে—

শ্রীচরণেষু সুজয়দা,

আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার আর আলোয় ফেরা হোল না। ফিরতে চাইলেও ফেরা যে যায় না। আপনি আমাদের জীবনে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার একটা রাস্তা দেখিয়েছিলেন। দোকান আমরা খুলে ছিলুম। ধীরে ধীরে কারবার চালু হয়ে গেল। কাজের চাপ বেড়ে গেল। কাজ কর্ম নিয়ে আমাদের বোনেদের মধ্যে হঠাৎ ঝগড়া ঝাটি শুরু হয়ে গেল। আমিই বেশির ভাগ কাজ করে দোকানটা চালাতে লাগলুম। তবুও আমার দুই বোনের অভিযোগ আমি কাজ করছি না। আমার মেজো বোন শুধু ক্যাসে বসে থাকত। তারপর আমার ওপর বদনাম দিল আমি নাকি ক্যাশ থেকে টাকা সরাচ্ছি। আমাকে তারা আর দোকানে থাকতে দেবে না। একদিন জোর করে দোকানে ঢুকতে গেলে দু'বোনে মিলে আমায় চুলের মুঠি ধরে মারল।

দোকান ছেড়ে দিলুম। ক'দিনের মধ্যে ওরাও দোকান বন্ধ করে একজনকে ভাড়া দিয়ে দিল। বাড়িতে বসে রইলুম। হাতে পয়সা নেই। বুঝলুম ভাল হতে চাইলেও যে ভাল হবার পথ সব সময় খোলা থাকে না। কেউ ফিরতে পারে, কেউ পারে না।

আবার আমি পুরনো পেশায় ফিরে গেলুম। যদিও আমার তেমন কোন দুঃখ নেই, এই ভেবে যে আমিও একজন সমাজে কাজের মানুষ...। আমারও দাম আছে। কেন না আমার মত পতিতারা আছে বলেই তো নোংরা পুরুষরা ঠাণ্ডা হয়। সমাজে মেয়েরা তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়। সম্ভ্রম বজায় রাখতে পারে। আমরা নীলকণ্ঠের জাত...। আমি আমার পেশায় রাণী। ওখানে অপর কেউ আমায় টলাতে পারবে না।

আপনি আমার চিরকালের সুজন, পূজনীয়। আপনার চড় আমার জীবনে আর্শীবাদ হয়ে থাক। নাই বা আলোয় ফিরতে পারলুম। আলোর মত অন্ধকারও যে সত্য। আর সেই অন্ধকারেই আমি সত্যবতী হয়ে বেঁচে থাকবো।

নমস্কারান্তে —

ইতি—
হতভাগ্য সীমা

চিঠিটা হাতে নিয়ে নির্বাক সুজয় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন দিন শেষে ধূসর নীল আকাশের বুকে পাখিরা দল বেঁধে বাসায় ফিরছে।

গণেশ সাধুখাঁ